Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাম্মী আক্তার মীম

রোলঃ 23100121695

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাম্মী আক্তার মীম

রোলঃ 23100121695

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাম্মী আক্তার মীম, আইডিঃ 23100121695 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

শাম্মী আক্তার মীম

আইডিঃ 23100121695

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

নিদর্শন এর শাব্দিক ব্যাখ্যা 7

জ্যোতির্বিজ্ঞান 8

পদার্থবিদ্যা 13

ভূগোল 15

ভূতত্ত্ববিদ্যা 18

সমুদ্রবিদ্যা 20

জীববিজ্ঞান 22

উদ্ভিদ বিজ্ঞান 23

প্রাণিবিজ্ঞান 25

ভ্রূণতত্ত্ব বিদ্যা 31

উপসংহার 33

রেফারেন্স 34

ভূমিকা

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে বহু নবী রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন এবং তাদের অনেকের উপর আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। আল কুরআন হল সর্বশেষ নাযিলকৃত আসমানী কিতাব যা আল্লাহ তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাযিল করেছেন। আল কুরআন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি সকল জ্ঞান- বিজ্ঞানের উৎস। এখানে ধর্মীয় বিধি-বিধানের পাশাপাশি প্রকৃতি, মহাবিশ্ব, মানবসৃষ্টি, ইতিহাস এবং সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। কুরআন বিজ্ঞানের কোন পুস্তক নয় কিন্তু এটা অসংখ্য নিদর্শন আয়াত এর পুস্তক। ৬ হাজারেরও অধিক আয়াত আল কুরআনে রয়েছে। তন্মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে এক হাজারের অধিক।

"আর যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তাতে কুরআন যা আমি আমার বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ করেছি তাহলে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এই কাজে সাহায্যের জন্য আহ্বান করো আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে বা সাক্ষ্যদাতাদেরকে যদি তোমরা হয়ে থাকো সত্যবাদী। কিন্তু তোমরা যদি তা করতে না পারো এবং নিশ্চয়ই কখনোই তা করতে পারবে না তাহলে তোমরা ভয় করো সেই আগুনকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সত্য প্রত্যাখ্যান কারীদের জন্য।" *(আল কুরআন ২: ২৩-২৪)*

ধর্ম আসলে বিশ্বাসের বিষয়; বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণের বিষয় নয়। গায়েবে বিশ্বাস করা অর্থাৎ না দেখেই বিশ্বাস করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত (যেমন আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করা, নবী-রাসূলগণকে না দেখে বিশ্বাস করা, জান্নাত-জাহান্নাম না দেখে বিশ্বাস করা ইত্যাদি) । বিজ্ঞান প্রমাণ করুক বা না করুক অথবা বিজ্ঞানের প্রমাণে আনন্দিত হলেও একজন মুমিন মাত্রই বিশ্বাস করবেন কুরআনের প্রতিটি আয়াত সত্য। ১৪০০ বছর আগে কোন বিজ্ঞানের সহায়তা দিয়ে অমুসলিমদের কাছে কুরআনের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। এ রাস্তায় হাটেন নি কোন সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমগণও। কোন বিশ্বাসের ব্যক্তির বিশ্বাস যদি সব ক্ষেত্রে প্রমানের ওপর

নির্ভর করে তবে তা আর বিশ্বাস নয়। আগেই বলা হয়েছে গায়েবে বিশ্বাস করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা সকলে জানি যে, অনেক সময় বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। এই রিপোর্টে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য ঘটনাগুলো (ফ্যাক্টস) বিবেচনা করা হবে; আলোচনা করা হবে না ঐসব কল্পনা ও মতবাদকে; যা ধারণা বা অনুমানের ওপর নির্ভরশীল ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়।

এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য হলো আধুনিক বিশ্বে আলোচিত কুরআনের বিভিন্ন বাস্তব নিদর্শন পর্যালোচনা করা; সেগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা এবং সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে এ বিষয়ে একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারণা উপস্থাপন করা।

নিদর্শন এর শাব্দিক ব্যাখ্যা

বাংলা "নিদর্শন" শব্দের আরবি অর্থ প্রসঙ্গভেদে ভিন্ন হতে পারে। সাধারণভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি আরবি শব্দ হলো—

آيَة (আয়াহ) — আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন; বিশেষ করে আল্লাহর শক্তি ও সত্যতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত।

عَلَامَة (আলামাহ) — চিহ্ন, লক্ষণ, নিদর্শন।

دَلِيل (দালিল) — প্রমাণ, সাক্ষ্য, নিদর্শন।

مِثَال (মিসাল) — উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, নিদর্শন।

ব্যাখ্যামূলকভাবে: "নিদর্শন" বলতে এমন কোনো চিহ্ন, লক্ষণ, প্রমাণ বা উদাহরণকে বোঝায় যা কোনো বিষয়ের সত্যতা, অস্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

উদাহরণ:
প্রকৃতির সৌন্দর্য আল্লাহর নিদর্শন।
আরবিতে: الطبيعة من آيات الله (প্রকৃতি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।)

ধোঁয়া আগুনের নিদর্শন।
এখানে "নিদর্শন" অর্থ علامة (লক্ষণ বা চিহ্ন)।

এই ঘটনা তার সাহসের নিদর্শন।
এখানে "নিদর্শন" অর্থ دليل (প্রমাণ)।
কুরআনিক অর্থে **"নিদর্শন"** বলতে সাধারণত **آية (আয়াহ)** শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বিগ ব্যাং তত্ত্ব:

বিজ্ঞানী জি ল্যামেটার সর্বপ্রথম বিগব্যাং তত্ত্বের ধারণা দেন। স্টিফেন হকিং এটা ব্যাখ্যা করেন। বিগ ব্যাং এক কথায় মহাবিস্ফোরণ। এটা মূলত বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের শুরুতে ঘটে যাওয়া এক বিশাল বিস্তার বা বিস্ফোরণকে বুঝায়। সমগ্র বিশ্বজগত প্রাথমিক বা আদি অবস্থা একটি বিশাল পিণ্ড (প্রাথমিক নিহারিকা বা প্রাইমারি নেবুলা) আকারে বিদ্যমান ছিল। এরপর সেখানে ঘটে এক মহাবিস্ফোরণ (মাধ্যমিক পৃথক করণ)। এরই ফলে ঘটিত হয় অসংখ্য ছায়াপথ (গ্যালাক্সিস)। অতঃপর এগুলো বহু খন্ডে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহুপুঞ্জ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। বহু দশক ব্যাপী জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতি পদার্থবিদগণ কর্তৃক সংগৃহীত পর্যবেক্ষণমূলক ও গবেষণামূলক তথ্য উপাত্ত দ্বারা এটি সমর্থিত।

"যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল, এরপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিলাম?" *(আল কুরআন-২১: ৩০)*

বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে বিপুল গ্যাসীয় পদার্থ বা মেঘমালা বিদ্যমান ছিল। আদি মহাকাশে বস্তুকে গ্যাসের চেয়ে "ধুম" শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা অতীততর সঠিক।

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ বিশেষ। তিনি একে এবং পৃথিবী কে বললেন: এসো তোমরা একসঙ্গে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তারা বলল: আমরা এলাম স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে।" *(আল কুরআন- ৪১: ১১)*

১৯২৫ সনে এডউইন হাবল নামে এক আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণমূলক সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে ঘোষণা করেন যে, ছায়াপথ গুলো পরস্পর পরস্পর হতে

দূরে সরে যাচ্ছে যার অর্থ হলো মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের এই প্রসারণ আজ বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআন বলেন,

"আমি ক্ষমতা ও দক্ষতা বলে নির্মাণ করেছি নভোমন্ডল এবং আমি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটাই।" *(আল কুরআন- ৫১: ৪৭)*

সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির পদার্থবিদদের মধ্যে অন্যতম বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম) নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন: "মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে" - এ আবিষ্কারটি বিংশ শতাব্দীর মহান বুদ্ধিবৃত্তি বিপ্লব গুলোর অন্যতম। আল কুরআনে মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণশীলতার উল্লেখ রয়েছে বহু পূর্বেই, এমনকি মানুষের টেলিস্কোপ তৈরির জ্ঞান আহরণের অনেক পূর্বে।

নক্ষত্র:

এক সময় ধারণা ছিল নক্ষত্রগুলো স্থির। কিন্তু জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের মাধ্যমে জানা গিয়েছে; মহাবিশ্বের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ এর কারণে নক্ষত্র আগের স্থান থেকে সরে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে এবং কিছু নক্ষত্র সব সময় চলমান থাকে। এসব বিষয়ে আধুনিক যুগে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ আবিষ্কারের মাধ্যমে জানা গেছে। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানায় কোন ধরনের টেলিস্কোপ ছিল না। টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি। এর আগে মহাকাশ সম্পর্কে মানুষ শুধু অনুমান করে কথা বলতো। গ্রীকদের অনেক অনুমানই পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যদিও তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিল। নক্ষত্র চলে, পিছনে সরে যায়, নিভে যায়, আলোহীন হয়ে যায়, অথবা পিছনের সরতে সরতে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়।

"আমি শপথ করছি নিশ্চিত ভাবে সেই সব নক্ষত্রের; যেগুলো ফিরে যায় এবং সেই সব নক্ষত্রের যেগুলো চলে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।" *(সুরা তাকভীর, আয়াত ১৫,১৬)*

সূর্য:

সুদীর্ঘ কালব্যাপী ইউরোপীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর স্থির নিশ্চল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। জগতে মহাবিশ্বের এই ভূগোকেন্দ্রিক মতবাদ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঠিক টলেমির সময় হতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস কোপার্নিকাস গ্রহের গতি সম্পর্কীয় সূর্য কেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রদান করেন। এ তথ্য দাবি করে যে, সৌরজগতের কেন্দ্রের সূর্য গতিহীন অবস্থায় আছে আর এটি কেন্দ্র করে গ্রহগুলো এর চারিদিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে।
১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ইউহান্নাস কেপলার "এসট্রোনোমিয়া নোভা" নামে একটি লেখা প্রকাশ করেন। তিনি এই লেখার উপসংহারে একথা বলেন যে, সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলো উপবৃত্তাকার কক্ষপথে শুধু ঘুরছে না বরং অনিয়মিত বেগে তারা তাদের নিজেদের কক্ষের চারিদিকেও ঘুরছে। এই জ্ঞানের আলোকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে পর্যায়ক্রমে রাত দিনের আগমনসহ সৌরজগতের বহু কিছুরই কার্য সাধন পদ্ধতি এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হয়।

এসব আবিষ্কারের পর, মনে করা হতো যে, সূর্য স্থির রয়েছে। পৃথিবীর ন্যায় সে তার অক্ষের চারিদিকে ঘুরে না।

"আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র; সকল মহাকাশী ও বস্তুই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।" *(আল কুরআন- ২১: ৩৩)*

উপরিউক্ত মূল আরবি আয়াতের "ইয়াসবাহুনা" শব্দটি "সাবাহা" শব্দ থেকে এসেছে। এটা গতিশীল বস্তুর গতির ধরন বোঝায়। শব্দটি যদি ভূপৃষ্ঠে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটি বোঝাবে মানুষটি হাঁটছেন বা দৌড়াচ্ছেন। যদি পানিতে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটি বোঝাবে তিনি সাঁতার কাটছেন। একইভাবে যদি শব্দটি মহাকাশে বস্তু যেমন সূর্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন এটি বোঝাবে সূর্য চক্রাকারে আবর্তন করছে যেমনটা এটি মহাকাশে ভ্রমণ করে থাকে। সূর্য তার নিজ অক্ষের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের সময় লাগে ২৫ দিন। প্রকৃতপক্ষে

মহাকাশে সূর্য মোটামুটি প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ মাইল বেগে ভ্রমণ করে এবং আমাদের ছায়াপথ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এর কেন্দ্রের চারিদিকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের সময় লাগে 20 কোটি বছর।

"সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে ধরে ফেলা এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, সকলেই মহাশূন্যে নিজ নিজ কক্ষ থেকে সন্তরন করে (সুনির্দিষ্ট নিয়মে)।" *(আল কুরআন- ৩৬: ৪০)*

পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে চন্দ্র যে সময় নেয় সেই একই সময়ে চন্দ্র তার নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুরে থাকে। একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে চন্দ্রের সময় লাগে সাড়ে ২৯ দিন।

সোলার প্রুভ নামক একটি যন্ত্র NASA (National Aeronautics and Space Administration) সূর্যের কার্যক্রম লক্ষ্য করার জন্য প্রেরণ করে। তা পৃথিবীর মানুষকে জানায় যে, সূর্যের ভিতরে অনবরত কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোমা অনবরত ফুটছে। ফিউশন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হয়ে তা পুড়ে বিশ্ববাসীকে আলো দিচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন পারমাণবিক বোমার চেয়েও হাইড্রোজেন বোমা বেশি শক্তিশালী।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেছেন- একসময় সূর্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। সূর্য তার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। সূর্যের ধ্বংস রয়েছে। কারণ সূর্য একটি নক্ষত্র। প্রতিটি নক্ষত্রের মধ্যেই হিলিয়াম গ্যাস জ্বলে রাতের আকাশ আলোকিত করে। এই হিলিয়ামগুলো যখন নিভে যায় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তখন সেগুলো বামুন গ্রহে রূপান্তরিত হয়।

"আর সূর্য তার গতিপথের ছুটে যাচ্ছে নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য। এটা তিনিই নির্ধারিত করে দিয়েছেন যিনি মহা শক্তিমান ও মহাজ্ঞানী।" *(আল কুরআন- ৩৬: ৩৮)*

"আল্লাহ যিনি খুঁটি ছাড়া আসমান সমূহ উচু করেছেন যা তোমরা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশে উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এ প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট

সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াত সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পারো।"

(আল কুরআন- ১৩: ২)

"তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আর তিনিই সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করে দিয়েছেন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করছে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সমস্ত কর্তিত্ব তারই, আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা খেজুরের আটির আবরণেরও মালিক নয়।" (আল কুরআন- ৩৫: ১৩)

"তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের ওপর এবং দিনকে রাতের ওপর জড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখো তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।" (আল কুরআন- ৩৯: ৫)

পৃথিবী:

আদিম কালে মানুষ বিশ্বাস করত যে, পৃথিবীর চ্যাপ্টা। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক হলেন প্রথম ব্যক্তি
যিনি ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর চারিদিকে জলপথে ভ্রমণ করে প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার।
আবার পৃথিবী বলের মতো পুরোপুরি গোলাকার নয়। তবে এটা ভূগোলকের মত অর্থাৎ এটা মেরুদয় চ্যাপ্টা।

"আর এরপর তিনি পৃথিবীকে করেছেন ডিম্বাকৃতি।" (আল কুরআন- ৭৯ :৩০)

এখানে মূল আরবি আয়াতের 'দাহাহা' আরবি শব্দ অর্থ হলো উট পাখির আন্ডা। উট পাখির আন্ডা, পৃথিবীর ভূগোলকের আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পদার্থবিদ্যা

প্রাচীনকালে ‘পরমাণুবাদ তত্ত্ব’ নামে একটি সুপরিচিত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ছিল। সর্বপ্রথম এ তত্ত্ব উত্থাপন করেন গ্রীক বিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করে ডেমোক্রিটাস নামে এক পন্ডিত যিনি ২৩ শত বর্ষ (২৩০০ বছর) পূর্বে বাস করতেন। ডেমোক্রিটাস ও তারপর পরবর্তী লোকেরা ধারণা করতেন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশে পরমাণু। প্রাচীন আরব গণ এই ধারণা পোষণ করতেন। আরবি শব্দ ‘যাররাহ’ সাধারণত পরমাণুকে বুঝায়। সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, পরমাণুকে বিভক্ত করা সম্ভব। ‘পরমাণুকে যে আরো ভাঙ্গা যায়’ এ তত্ত্বটি বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। ১৪০০ বছর পূর্বে এ ধারণাটি অস্বাভাবিক বলে মনে হতো এমনকি একজন আরবের নিকটও। তার নিকট ‘যাররাহ’ এর অর্থ ছিল ‘ঐ সীমা যার বাইরে কেউ যেতে পারে না।’

“অবিশ্বাসীরা বলে: আমাদের নিকট কিয়ামত আসবেনা। (হে নবী) তুমি বলো: কেন আসবে না? আমার প্রতিপালকের শপথ অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবেই। যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, আকাশ মন্ডলে ও পৃথিবীতে পরমাণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু তার নিকট থেকে লুকিয়ে নেই তবে সকল কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে।” *(আল কুরআন- ৩৪: ৩)*

এই আয়াতটি আল্লাহর সর্বজ্ঞতা, প্রকাশ্য বা গোপন সকল বস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছে। এই আয়াতটি আরো অগ্রসর হয়ে প্রকাশ করেছে যে, পরমাণু অপেক্ষা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর সকল কিছু সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। সুতরাং এ আয়াত হতে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয় যে, পরমাণু হতে ক্ষুদ্রতার কোন কিছু বিদ্যমান থাকা সম্ভব অথচ এ সত্য অতি সম্প্রতি উদঘাটন করেছে আধুনিক বিজ্ঞান।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"মহাকাশ এবং পৃথিবীতে একটি অণু পরিমান কিছুও তার অগোচরে নেই। এমনকি অনুর চেয়েও ক্ষুদ্রতম অর্থাৎ পরমাণু কিংবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা একটি স্পষ্ট কিতাবে লিখা নেই।" *(সূরা ইউনুস, আয়াত-৬১)*

আয়াতটি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই আয়াতে অনুর কথা বলা হয়েছে। আরবি 'যাররাহ' শব্দের অর্থ অনু। এরপরে অনুর চেয়েও ক্ষুদ্রতম পরমাণুর কথা বলা হয়েছে। এর পরে তার চেয়েও বড় কিছু। পরমাণুর চেয়েও বড় কিছু আর কি? পরমাণু ভাঙ্গলে বিশাল শক্তির উৎপন্ন হয়। প্রচন্ড শক্তির উৎপন্ন হয়। সেটার কথাই বলা হয়েছে।

এই আয়াতে যে অনু - পরমানু এবং পরমাণু থেকে মহাশক্তির উৎপন্ন হয়; সে আলোচনা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন মুসলিম বিজ্ঞানী ডঃ জাগলুন নাজ্জার। যিনি জামে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিজ্ঞানের প্রফেসর। ফ্রান্স থেকে পাস করা এই বিজ্ঞানী পবিত্র কুরআন থেকে ১ হাজার বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত বের করেছেন। এবং তিনি বলেছেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শাখা এক হাজার এবং পবিত্র কুরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কে এক হাজার আয়াত রয়েছে।

ভূগোল

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে বার্নাড পালিসি সর্বপ্রথম পানি চক্রের ধারণা বর্ণনা করেছিলেন বর্তমানে যেটা প্রচলিত। তিনি বর্ণনা করেছিলেন সমুদ্র হতে পানি কিভাবে বাষ্পীভূত হয়ে পরের শীতল হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং এই মেঘমালা দূরবর্তী স্থানে গমন করে উপরে উঠে পরে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারের পতিত হয় এই পানি নদী-নালা খাল বিল রূপে জমা হয় এবং প্রবাহিত হয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন চক্রে পুনরায় মহাসাগরে ফিরে আসে।

আল-কুরআনে পানি চক্রের বর্ণনা, আল্লাহ বলেন:

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তিনি তা প্রবেশ করান ধরণীর প্রস্রবণ সমূহের মধ্যে এবং তার দ্বারা নানা বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন।" *(আল কুরআন- ৩৯: ২১)*

"আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন ঐসব লোকদের জন্য যারা বোধশক্তি সম্পন্ন।" *(আল কুরআন- ৩০: ২৪)*

"আর আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মতো অতঃপর আমি তা জমিনে মাটিতে সংরক্ষণ করি। আমি উহাকে অপসারিত করতেও সক্ষম (অতি সহজেই)।"

(আল কুরআন- ২৩: ১৮)

আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্বে কোন পুস্তকে পানিচক্রের এমন নির্ভুল বর্ণনা দেয়া হয়নি।

আল কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“আর আমি বৃষ্টি- গর্ভ বায়ু প্রেরণকারী, তারপর আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই (প্রচুর পরিমাণে)।” *(আল কুরআন- ১৫: ২২)*

“তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ মেঘ মালাকে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করেন এরপর তাদেরকে একত্র করেন এবং পরে তা পঞ্জিভূত করেন একটি স্তুপে। অতঃপর তুমি দেখতে পাও এর মধ্য হতে নির্গত হয় বৃষ্টি ধারা। আর তিনি আকাশস্থিত পাহাড়সদৃশ মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেন শিলা এবং তা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন ও যাকে ইচ্ছা তার ওপর হতে দূরে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক এমন যেন চোখের দৃষ্টি শক্তিকে প্রায় কেড়ে নেয়।” *(আল কুরআন- ২৪: ৪৩)*

“আল্লাহ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে বায়ু মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে, এরপর তিনি মেঘমালাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, তা খন্ড-বিখন্ড করেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য হতে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা পরে যখন তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌঁছে দেন, তখন তারা হয় আনন্দিত।” *(আল-কুরআন- ৩০: ৪৮)*

বিজ্ঞানীরা বৃষ্টির পানি নিয়ে ল্যাবে গবেষণা করে দেখেছেন যে, বৃষ্টির পানির মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা মাটিকে উর্বর ও মৃত জমীনকে তাজা করতে পারে। সূর্যের প্রখর তাপে মাটির মধ্যে থাকা আটটি উপাদান যেমন: আয়রন, ফসফেট, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অক্সিজেন, খনিজ লবণ ও জৈব সার। যেগুলো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং জমিন ফেটে চৌচির হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাআলার হুকুমে যখন বৃষ্টি হয়, জমিনের ফাঁকা দিয়ে এই পানিগুলো জমিনের গর্ভে প্রবেশ করে এবং মাটিকে তাজা করে, উর্বর করে। মরা জমিনকে আবার সতেজ করে তোলে। বৃষ্টির পানির মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, যা মাটির মধ্যে যে উপাদান গুলো সূর্যের তাপের কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়; সেগুলো আবার সতেজ করে তোলে। পবিত্র কুরআনে সূরা মুমিনুনের ১৮ নম্বর আয়াত-

“আমি নাজিল করেছি আসমান থেকে পরিমাণ মাফিক পানি। সেই পানিকে আমি সংরক্ষণ করেছি মাটিতে।”

আকাশ থেকে মেঘ ভারি হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ হয় অতঃপর যে মাটি চৈত্র মাসে ফেটে গিয়েছিল, ওই ফাঁকা দিয়ে পানি প্রবেশ করে। প্রবেশ করে মাটিকে সতেজ, সজীব ও তাজা করে তোলে। এটা কি আল্লাহ রহমত বলেছেন।

“আল্লাহর রহমতের নিশানার দিকে লক্ষ্য করো! কিভাবে তিনি মৃত জমিনকে জিন্দা করেন।” *(সূরা রুম, আয়াত- ৫০)*

ভূতত্ত্ববিদ্যা

ভূতত্ত্ববিজ্ঞান আমাদেরকে বলেন যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৭৫০ মাইল বা ৬০৩৫ কিলোমিটার এবং পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন আবরণ যার উপর আমরা বাস করি এটা খুবই পাতলা। এর পুরুত্ব ১ থেকে ৩০ মাইলের মধ্যে। যেহেতু কঠিন আবরণটি পাতলা, তাই এর কম্পনের সম্ভাবনা টা বেশি। পর্বতগুলো পেরেক বা তাবুর কিলক এর মত কাজ করে ও ভূপৃষ্ঠের এই কঠিন আবরণটিকে ধরে রাখে এবং তাকে দেয় সুস্থিতি। কুরআনে হুবহু এর বর্ণনাই রয়েছে-

"আমি কি পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ বিছানা স্বরূপ এবং পর্বতসমূহকে কিলকস্বরূপ সৃষ্টি করিনি?" *(আল কুরআন -৭৮: ৬-৭)*

এই আয়াতের আরবি মূল আয়াতের "আওতাদ" শব্দটির অর্থ খুঁটি বা কিলক (ঐগুলোর মত যা ব্যবহার করা হয় তাবু খাটাতে) এগুলো হল ভূতাত্ত্বিক ভাজসমূহের গভীর ভিত্তি।

'পৃথিবী' নামক একটি বই বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বুনিয়াদি রেফারেন্স পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যতম লেখক ছিলেন ডক্টর ফ্রাঙ্কপ্রেস, যিনি ছিলেন 12 বছর ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান একাডেমীর প্রেসিডেন্ট এবং ছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এর বিজ্ঞান উপদেষ্টা। এই পুস্তকে তিনি চিত্র ও উপমা সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, পর্বত কিলকাকৃতির; পর্বত নিজেই পুরোটার একটি ক্ষুদ্র অংশ যার মুল মাটির গভীরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। ডক্টর প্রেসের মতে পর্বতসমূহ ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণটিকে স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর কম্পন রোধে পর্বতসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আল কুরআন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

"আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত মালা যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়।" *(আল কুরআন- ২১: ৩১)*

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ বহু শক্ত স্তর মজবুত প্লেট (পৃথিবীর শক্ত বহিরাবরণ কে অশ্বমন্ডল বলে। এর অংশ হচ্ছে প্লেট।) বা পাতে বিরক্ত যেগুলোর পুরুত্ব হলো প্রায় ১০০ কিলোমিটার। এই পাত বা প্লেটগুলো আংশিক গলিত অঞ্চলে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই আংশিক গলিত অঞ্চল কে এসথেনোসফিয়ার বলে।

পর্বত গড়া শুরু হয় পাক বা প্লেটগুলোর প্রান্ত সীমায়। পৃথিবীর কঠিন আবরণ (ভূত্বক) পাঁচ কিলোমিটার মোটা বা পুরো মহাসাগরের নিচে, প্রায় ৩৫ কিলোমিটার মোটার সমতল মহাদেশীয় পৃষ্ঠা দেশগুলোর নিচে এবং প্রায় ৮০ কিলোমিটার মোটা বিশাল পর্বতমালার নিচে। এগুলো হলো মজবুত ভিত্তি যার উপর পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে। কুরআনও পর্বত সমূহের শক্ত ভিত্তি সম্পর্কে বলে।

"আর তিনি পর্বতগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।" *(আল কুরআন- ৭৯: ৩২)*

সমুদ্রবিদ্যা

আল কুরআনে আল্লাহ বলেন -

"তিনি দুটি সমুদ্রকে বহমান করেছেন, যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু উনাদের মধ্যে রয়েছে এক পর্দা বা অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।" *(আল কুরআন- ৫৫: ১৯-২০)*

এ আয়াতের মূল আরবীতে "বারযাখ" এর অর্থ হল অন্তরাল, পর্দা, আড়াল বা প্রাচীর। কিন্তু অন্তরাল, পর্দা বা প্রাচীর বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি সে রূপ এটা কোন স্বাভাবিক বাহ্য পর্দা বা প্রাচীর বা অন্তরাল নয়।

আরবি শব্দ "মার্জা" এর আক্ষরিক অর্থ হলো তারা উভয়ে মিলিত হয় এবং একে অপরের সাথে মিশে যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, যেসব স্থানে দুটি ভিন্ন সাগর এসে মিলিত হয় তথা উভয়ের মধ্যে থাকে পর্দা বা অন্তরাল। এই পর্দাটি দুটি সাগরকে এমন ভাবে পৃথক করে দেয় যে, যাতে করে প্রতিটি সাগর তার নিজস্ব তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং ঘনত্ব অক্ষুন্ন রাখে। *(Principles of Oceanography, Davis, pp. 92-93).*

বিজ্ঞানী রজার ড্রেক পবিত্র কুরআনের এ আয়াত গবেষণা করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি দেখেছেন দুই সাগরের একটি সাগরের পানি অন্য সাগরে প্রবেশ করে না। আটলান্টিক মহাসাগরের মাছগুলো প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করে না। প্রশান্ত মহাসাগরের মাছগুলো অথবা সামুদ্রিক প্রাণীগুলো আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে না। এর কারণ হিসেবে কুরআনে বলা হয়েছে: একটি অন্তরায় রয়েছে। উনি অনেক গবেষণা করে এই অন্তরায় খুঁজে বের করেছেন। এখানে ডেনসিটি বা ঘনত্ব জাতীয় কিছু আছে, যার কারনে প্রবেশ করে না। ২ সাগরের মিলনস্থল যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা প্রদেশে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের পানি ঘোলা রঙের দেখায় আর আটলান্টিক মহাসাগরের পানি নীল বা হালকা কালচে বর্ণের দেখায়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে,

আটলান্টিক মহাসাগরের অংশে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা প্রদেশের বরণ কলা মিষ্টি পানি যা প্রশান্ত মহাসাগরের লবণাক্ত পানির সাথে মিলে না বা মিশে না। মাঝখান দিয়ে একটি বরাবর রেখা লক্ষ্য করা যায় যে আমরা বিভিন্ন ভিডিওতে দেখেছি।

"দুটি সমুদ্র সমান নয়, একটির পানি মিষ্টি; পান করতে সুস্বাদু এবং অপরটি লবণাক্ত।"

(সূরা ফাতির :আয়াত- ১২)

এই বৈশিষ্ট্য শুধু যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা প্রদেশের মিলনের স্থলেই পাওয়া যায়। এছাড়া ও পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে দুটি সাগরের মিলনস্থল দেখা যায় কিন্তু সেখানে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। যেমন রোম সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর যা জাবালুত তারেক বা জিব্রাল্টার পাহাড়ে নিকটে মিলিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে নদী সাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে, সেখানে সাগর থেকে অনবরত লবণাক্ত পানি নদীতে প্রবেশ করার কথা; কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিনের কুদরতে নদীর পানি মিষ্টি থেকে যায় এবং সাগরের লবণাক্ত পানি গুলো নদীতে প্রবেশ করে না। যদিও প্রত্যেকটি নদীর মুখ সাগরের সাথে লাগানো রয়েছে এবং জোয়ার ভাটা চলমান রয়েছে।

"এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন বহমান দুটি সাগরের মধ্যে অন্তরায় বা পর্দা।" *(আল কুরআন- ২৭: ৬১)*

আল্লাহ বলেন:

"তিনি দুই সাগরকে সমান্তরালে প্রবাহিত করেন। এর একটি সুপেয় মিষ্টি অপরটির লবণাক্ত, উভয়ের মধ্যে তিনি রেখেছেন একটি পর্দা, দুর্ভেদ্য অন্তরাল যা এ দুটোকে মিশে যেতে দেয় না।" *(আল কুরআন- ২৫: ৫৩)*

জীববিজ্ঞান

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখেনা যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল এরপর আমি তাকে পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রতিটি জীবিত জিনিস কে পানি হতে সৃষ্টি করেছি তবুও কি তারাই ঈমান আনবে না।" *(আল কুরআন- ২১: ৩০)*

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, জীব কোষের যে মৌলিক উপাদান সাইটোপ্লাজম; তা ৮০% পানি দিয়ে তৈরি। আধুনিক গবেষণা আরও প্রকাশ করেছে যে, অধিকাংশ জীবেই ৫০% হতে ৯০% পানি আছে এবং প্রতিটি জীবন্ত সত্তারই বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজন।

"আর আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে।" *(আল কুরআন- ২৪: ৪৫)*

"আর তিনি পানি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এ থেকে তার বংশগত ও অপরটি বৈবাহিক সম্পর্ক এ দুটি আত্মীয়তা ধারা সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রতিপালক সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" *(আল কুরআন- ২৫: ৫৪)*

উদ্ভিদ বিজ্ঞান

আল কুরআন ঘোষনা করে:

"তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে আমি নানা প্রকার উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করি যা একটি অন্যটি হতে আলাদা।" *(আল কুরআন- ২০: ৫৩)*

আল কুরআনে উল্লেখ আছে:

"আর তিনি প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, দু দু প্রকার।" *(আল কুরআন- ১৩: ৩)*

উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের প্রজননের সর্বশেষ সৃষ্টি হল ফল। ফলের পূর্ববর্তী অবস্থা হলো ফুল যার আছে পুরুষ অঙ্গ বা পুংকেশর এবং স্ত্রী অঙ্গ বা গর্ভকেশর। পরাগরেণ্য বাহিত হয়ে ফুলে এসে পড়লে তাতে ফল ধরে। পালাক্রমে পরিপক্ক হয় এবং তার বীজ মুক্ত করে। পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গের অস্তিত্ব সুচিত করে। এই সত্যই প্রকাশ করেছে আল কুরআন।

আল কুরআন ঘোষনা করে:

"আর আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।" *(আল-কুরআন- ৫১: ৪৯)*

এই আয়াতটি সকল জিনিসেরই উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে, এটা মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও ফল ছাড়াও বিদ্যুতের ন্যায় অন্য কিছুকেও বুঝায়। যেমন বিদ্যুতে রয়েছে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ, সেরকম প্রত্যেক বস্তুর পরমাণুতে ঋণাত্মক চার্জবাহী ইলেকট্রন ও ধনাত্মক চার্জবাহী প্রোটন রয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

“পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।” *(আল কুরআন- ৩৬: ৩৬)*

প্রাণিবিজ্ঞান

"আল্লাহ সকল বিচরণশীল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে কোন প্রাণী বুকের উপর ভর দিয়ে চলে, কোন প্রাণী দুই পায়ের উপর ভর করে চলে, কোন প্রাণী চার পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে।" *(সূরা নূর, আয়াত- ৪৫)*

পাখি:

আল্লাহ বলেন:

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল সকল প্রাণী এবং ডানায় ভর করে উড়ন্ত সকল পাখি ওরা সকলে তোমাদের মত একটি সম্প্রদায় (হিসেবে জীবন ধারণ করে)।" *(আল কুরআন- ৬: ৩৮)*

গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাণী ও পাখি এরা সকলেই দলবদ্ধ হয়ে বাস করে অর্থাৎ তারা সংগঠিত করে, একসঙ্গে বাস করেও কাজ করে।

"তারা কি লক্ষ্য করেনি আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পক্ষীকুলের প্রতি? আল্লাহ ব্যতীত কেউ তাদেরকে ঊর্ধ্বে ধরে রাখে না। অবশ্য এতে রয়েছে নিদর্শন তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে।" *(আল কুরআন- ১৬: ৭৯)*

"তারা কি লক্ষ্য করেনা তাদের ওপর উড়ন্ত পক্ষীকুলকে ডানা বিস্তার করতে এবং গুটিয়ে নিতে? দয়াময় ব্যতীত আর কেউই তাদেরকে ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখেন।" *(আল কুরআন- ৬৭: ১৯)*

জোক:

আল্লাহ তাআলা জোককেও অহেতুক সৃষ্টি করেননি। চিনে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই লীচ থেরাপি বা জোক থেরাপি চলে আসছে। যদি কারো পায়ের নখের কোনা

পচে, তাহলে সেখানে জোঁক লাগিয়ে দেয়া হয়। জোকটি বিষাক্ত ও পচা রক্ত খেয়ে ফেলে। আর যদি কারো বিষফোঁড়া হয়, তার বিষ ফোঁড়ায় জোক লাগিয়ে দেওয়া হয়। জোক ভেতরে বিষাক্ত রক্ত খেয়ে ফেলে। এটাকেই লিচ থেরাপি বলা হয়। এই পদ্ধতি এখনো চীনে প্রচলিত রয়েছে।

মৌমাছি:

আল্লাহ বলেন:

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে মৌচাক বানানোর কৌশল শিখিয়ে মৌমাছিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানাও পাহাড়ে, গাছে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। তারপর আহরণ কর সব রকম ফুলের রস এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশস্ত সহজ পথ দক্ষতার সাথে বের করে ফেল।" *(আল কুরআন- ১৬: ৬৮-৬৯)*

ভন ফ্রিসচ ১৯৭৩ সনে মৌমাছিদের আচরণ ও বার্তা বিনিময় ও যোগাযোগ বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একটি মৌমাছি নতুন কোন বাগান বা ফুলের সন্ধান পেলে তাকে ফিরে এসে সে তার সঙ্গীদের তথায় পৌঁছানোর সঠিক দিক ও মানচিত্র মৌমাছি নৃত্য নামে পরিচিত পদ্ধতির মাধ্যমে বলে দেয়। মৌমাছিদের এই গতিবিধির উদ্দেশ্য হল শ্রমিক মৌমাছিদের মধ্যে বার্তা প্রেরণ। মৌমাছিদের এই গতিবিধির অর্থ ও উদ্দেশ্য আলোকচিত্র ও অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছে কিভাবে একটি মৌমাছির দক্ষতার সাথে তার প্রভুর প্রশস্ত পথ বের করে ফেলে। শ্রমিক মৌমাছি বা সৈনিক মৌমাছি হল স্ত্রী মৌমাছি। সূরা আন নাহল, সূরা নং ১৬, আয়াত নং ৬৮-৬৯ এ মৌমাছির জন্য স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে।

মৌমাছি সম ছয়কোণ বিশিষ্ট কক্ষ নির্মাণ করতে পারে। চাকের সবগুলো ঘর একই মাপের। এরকম নিখুঁত ঘর মানুষ তৈরি করতে পারবে না। মৌমাছি পরাগায়নের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। যদি মৌমাছি ফুলের পরাগায়ন না ঘটায়, তাহলে ফুল থেকে ফলও হবে না। আর ফল থেকে বীজ হয়ে নতুন গাছও হবে না। যদি গাছ কম

হয় তবে অক্সিজেন কমে যাবে। আর মানুষ মারা যাবে। মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে মানবজাতির খেদমত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"উহার (মৌমাছির) পেট থেকে বের হয় বিভিন্ন রঙের পানীয় (মধু)। যার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য শিফা বা রোগ মুক্তি।" *(সূরা নাহল, আয়াত- ৬৯)*

এখন আমরা জানতে পেরেছি যে, মধুর রোগ নিরাময়ের ও লঘু জীবাণু নাশক গুণাবলী রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ানরা ক্ষত থাকার জন্য মধু ব্যবহার করত। মধু ক্ষতটিতে আদ্রতা ধরে রাখে এবং খুবই কম ক্ষতচিহ্নযুক্ত চামড়া থেকে যায়। কারণ মধুর ঘনত্বের কারণে ক্ষতস্থানে কোন ছত্রাক বা জীবাণু জন্মাতে পারে না।

ইংল্যান্ডের নার্সিংহোমের অনারোগ্য বক্ষ ব্যাধি ও আলঝাইমারস রোগে আক্রান্ত 22 জন রোগীরও নাটকীয় উন্নতি দেখা যায়। জীবাণু প্রতিরোধকল্পে মৌচাক বন্ধ করার জন্য মৌমাছিরা যে প্রোপলিস নামক একপ্রকার বস্তু উৎপন্ন করে; সন্ন্যাসিনী সিস্টার ক্যারোল এই প্রোপোলিস দ্রব্যটির সাহায্যেই এই সকল রোগীদের চিকিৎসা করেছিলেন। *('এটাই সত্য' (This is the truth) এ শিরোনামের Video Tape)*

যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন উদ্ভিদের কারণে এলার্জিতে ভোগেন তবে তাকে ঐ উদ্ভিদের মধু পান করালে তার দেহে ওই এলার্জি প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হবে। আর মধুতে আরো রয়েছে ফ্রুক্টোজ এবং ভিটামিন 'কে'।

মধু, তার উৎস ও গুনাগুন সম্পর্কে কুরআনে ধারণকৃত এই জ্ঞান, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ায় বহু শতাব্দি পরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

মাকড়সা:

মহান আল্লাহ বলেন:

"যারা আল্লাহকে ছেড়ে অপর কাউকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সার মত, যে নিজের জন্য এটি ঘর বানায়। নিশ্চয়ই সব ঘরের চেয়ে মাকড়সার ঘরই অধিক দুর্বল যদি তারা জানতো।" *(আল কুরআন- ২৯: ৪১)*

কুরআন হালকা-পাতলা, সূক্ষ্ম, দুর্বল ক্ষণ ভঙ্গুর হিসেবে মাকড়সার চালের বাহ্যিক বর্ণনা দেওয়া
ছাড়াও;কুরআন মাকড়সার ঘরে আত্মীয়তার অসারতার উপরেও জোর দিয়েছে। মাকড়সার ঘরেই স্ত্রী মাকড়সা অধিক সময়েই তার সঙ্গী পুরুষ মাকড়সাকে মেরে ফেলে।

এই রূপক দৃষ্টান্তটি ঐসব লোকদের এরূপ সম্পর্কের দুর্বলতার দিকটি উল্লেখ কর, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই জগতে ও পরজগতে নিজেদের জন্য অন্যদের নিকট নিরাপত্তা অনুসন্ধান করে থাকে।

মাছি:

মাসিকে প্রাকৃতিক ঝাড়ুদার বলা হয়। মাছির ছয়টি পা থাকে। পাঁচটি চোখ থাকে। মাঝি এক সেকেন্ডে ছয়শত বার বার ডানা ঝাঁপিয়ে ৫ ফুট উপরে উঠে যায়। মাছি উল্টো দিকে উঠতে পারে। পেটে দুটি ছিদ্র থাকে; যার মাধ্যমে সে নিশ্বাস নেয়। হাউসফ্লাই মাছি জীবাণু ছাড়ানো প্রতিরোধ করে।

শক্ত জীবাণুগুলো মাছিরা পায়ে পিষে ধ্বংস করে। দুর্বল জীবাণু মাছির উড়ার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। মাসি যখন কোন খাবারে পতিত হয়, হাদীস শরীফে ঐ মাছিকে ঐ খাবারের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে বলা হয়েছে। কারণ এর এক ডানায় জীবাণু ও অন্য ডানায় এর প্রতিষেধক থাকে।
মাছি প্রথমে খাবারের মধ্যে জীবাণুযুক্ত ডানা ডুবিয়ে দেয়। তার অন্য ডানায় এর প্রতিষেধক থাকে। তাই খাবারের মধ্যে ওই মাছিটিকে ডুবিয়ে দিলে জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। এরপরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফেলে দিতে বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন:

যখন মাছি তোমাদের কারো পানপাত্রের মধ্যে পতিত হয়; সে যেন তাকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। এরপর তাকে উঠিয়ে ফেলে দেয়। নিশ্চয়ই তার এক ডানায় রোগ রয়েছে অপর ডানায় শেফা বা রোগ মুক্তি রয়েছে। (সহীহ্ বুখারী, চিকিৎসা অধ্যায়)

পিঁপড়া:

মহান আল্লাহ বলেন:

"সুলাইমানের সামনে জিন, মানুষ ও পাখিদের বাহিনীকে সমবেত করা হলো, উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে। যখন তারা পিপিলিকা অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছালো, তখন একটি পিপীলিকা বলল: হে পিলিকারা! তোমরা তোমাদের গর্তে বা ঘরে প্রবেশ কর যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষ্ট করে না ফেলে।" *(আল কুরআন- ২৭: ১৭ - ১৮)*

সাম্প্রতিক সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পিপীলিকাদের জীবনধারার এমন সব সঠিক তথ্য প্রদর্শন করেছে যা পূর্ববর্তীরা মোটেই জানতো না। গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের জীবনধারার সাথে যে সকল প্রাণী বা কীটপতঙ্গের জীবনধারার ঘনিষ্ঠতম সদৃশ্য রয়েছে সেটা হল পিপীলিকার জীবনধারা।

পিপিলিকার সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত গবেষণা লব্ধ ফলাফল হতে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয়-

১. মানুষের ন্যায় পিপীলিকা একইভাবে মরদেহ কবরস্থ করে।
২. পিপীলিকাদের রয়েছে শ্রম বিভাজনের পরিশীলিত উন্নত পদ্ধতি, তাই তাদের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক, শ্রমিক প্রধান, শ্রমিক ইত্যাদি আছে।
৩. মাঝেমধ্যে খোশ গল্প করার জন্য তারা নিজেরা একসঙ্গে মিলিত হয়।
৪. নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তাদের রয়েছে উন্নত যোগাযোগ পদ্ধতি।
৫. তারা নিয়মিত বাজার বাসায় দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য।

৬. শীতকালে দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা খাদ্যশস্য জমা করে রাখে এবং যদি শস্য কণার অঙ্কুরিত হওয়া শুরু হয় তারা তখন শিকড় গুলো কেটে দেয় মনে হয় তারা এটা বুঝে যে, অংকুর বৃদ্ধির জন্য রেখে দিলে এটা প্রতি নষ্ট হয়ে যাবে। জমাকৃত খাদ্যশস্য বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেলে তারা সেগুলো রোদে শুকানোর জন্য বের করে আনে, শুকিয়ে গেলে আবার তারা সেগুলো ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে তারা এটা জানে যে, আদ্রতা অংকুর গজানোর কারণ এবং এর ফলে শস্যের পচন হতে পারে।

ভ্রূণতত্ত্ব বিদ্যা

ইয়েমেনের প্রখ্যাত পন্ডিত শায়খ আব্দুল মাজীদ আজিনদানির নির্দেশনায় একদল মুসলিম পণ্ডিত গুণতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস হতে তথ্যগুলো চয়ন করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এরপর তারা কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় এর শব-ব্যবচ্ছেদ বিভাগের চেয়ারম্যান ও ভ্রুন তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর কেইথ মুর এর নিকট উপস্থাপন করেন। বর্তমানে তিনি ভ্রূণ তত্ত্ববিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। তিনি খুবই যত্ন ও সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে বলেন: ভ্রূণের তথ্য সংক্রান্ত কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত অধিকাংশ তথ্যই ভ্রুণতত্ত্ব ক্ষেত্রে আধুনিক আবিষ্কারের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ এবং কোন দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তবে কিছু সংখ্যক আয়াতের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। আয়াতের পরিবেশিত তথ্য গুলো সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান না থাকায় এসব তথ্যগুলো সঠিক না বেঠিক তা বলতে তিনি অপরগতা প্রকাশ করেন। ভ্রুণতত্ত্ব বিজ্ঞানে, আধুনিক গবেষণা কর্মকাণ্ডে ও লেখালেখিতেও এসবের কোন উল্লেখ নেই।

আল্লাহ বলেন:

“পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তের পিণ্ড থেকে।” *(আল কুরআন- ৯৬: ১-২)*

আরবি মূল আয়াতের ‘আলাক’ শব্দের অর্থ জমাট বাধা রক্তপিণ্ড। এছাড়াও এটা বলতে বোঝায় জোঁকের মতো বস্তু।

প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রুণ জোঁকের মতো দেখায় কিনা এ বিষয়ে ডঃ কেইথ মুর এর কোন জ্ঞান ছিল না। এটা যাচাই করার উদ্দেশ্যে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থার ওপর গবেষণা শুরু করেন। একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ভ্রুনের প্রাথমিক অবস্থার সাথে একই জোকের চিত্রের তুলনা করে দেখেন। তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন উভয়ের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখে।

১৯৮১ সনে সৌদি আরবের দাম্মামে মেডিকেল কনফারেন্সে ডক্টর মুর বলেন: কুরআনে বর্ণিত মানুষের ক্রমবিকা সম্পর্কে তথ্যাবলির ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ পেয়ে আমি গভীরভাবে আনন্দিত। এটা আমার নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ সকল বর্ণনা অবশ্যই আল্লাহর নিকট হতে এসেছিল। কারণ এগুলোর প্রায় সকল জ্ঞানই পরবর্তী বহু শতাব্দীর পরেও আবিষ্কৃত হয়নি। এটা আমার কাছে প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।

(এটাই সত্য (This is the truth) শিরোনামের Video Tape)

মহান আল্লাহ বলেন:

"সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত কি বস্তু হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সাবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও পাঁজরাস্থির মধ্য হতে।" *(আল কুরআন- ৮৬: ৫-৭)*

আল্লাহ আরও বলেন:

"অতঃপর তিনি তার (মানুষের) বংশধরদের সৃষ্টি করেন তুচ্ছ নগণ্য তরল পদার্থের নির্যাস হতে।" *(আল কুরআন- ৩২: ৮)*

ভ্রুনের লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় শুক্রানুর প্রকৃতির দ্বারা ডিম্বানুর প্রকৃতির দ্বারা নয়। একটি শিশু- নারী না নর তা নির্ভর করে 23 তম ক্রমোজোম জোড়াটি যথাক্রমে XX না XY এর উপর।

প্রধানত লিঙ্গ নির্ধারণ হয়ে থাকে নিষিক্তকরণের সময় এবং এটা নির্ভর করে ডিম্বানুকে শুক্রানুর কোন প্রকার লিঙ্গ ক্রোমোজোম নিষিক্ত করে তার ওপর। যদি এটা X বহনকারী শুক্রাণু হয় যা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তাহলে ভ্রুণ হবে স্ত্রী লিঙ্গ এবং যদি এটা Y বহনকারী শুক্রাণু হয় তাহলে ভ্রুণ হবে পুংলিঙ্গ।

"এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন যুগল পুরুষ ও নারী এক ফোঁটা শুক্র বিন্দু (বীর্য) থেকে যখন তা স্খলিত হয়।" *(আল কুরআন- ৫৩: ৪৫ - ৪৬)*

উপসংহার

এই গবেষণার আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক নিদর্শন আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আলোকে নতুন মাত্রায় তাৎপর্য লাভ করেছে। মহাবিশ্বের বিস্তার, মানবসৃষ্টির ধাপ, পানি ও জীবনের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির ভারসাম্য সম্পর্কিত কুরআনিক বর্ণনাসমূহ মানুষের চিন্তা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করে এবং সৃষ্টিজগত সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির পথ উন্মুক্ত করে।

গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, কুরআনের উদ্দেশ্য মূলত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা নয়; বরং মানুষকে পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও সত্য অনুসন্ধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার কুরআনের কিছু আয়াতকে নতুনভাবে অনুধাবন করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং কুরআনের জ্ঞানচর্চামূলক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করেছে।

অতএব, বলা যায় যে কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক নিদর্শনসমূহ কেবল তথ্যগত আলোচনার বিষয় নয়; বরং এগুলো মানবজাতিকে সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন, জ্ঞান অনুসন্ধান এবং সৃষ্টিকর্তার মহিমা সম্পর্কে গভীর চিন্তার দিকে পরিচালিত করে। এ কারণেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগেও কুরআনের এসব নিদর্শন গবেষণা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে।

রেফারেন্স

১. কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সঙ্গতিপূর্ণ নাকি সঙ্গতিহীন? (মূল: ড. জাকির নায়েক; অনুবাদ: মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মল্লিক)

২. আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক রহস্য (কামরুল ইসলাম)

৩. বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান (মূল: ড. মরিস বুকাইলি; ভাষান্তর: আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ)

৪. আল কুরআন